মানবাধিকার কেবল কাগজে-কলমে

গোপনে ভয়াবহ নির্যাতন

হাসান মূর্তাজা

ইরাকি বন্দিদের ওপর মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের নির্যাতনের আরেক প্রস্থ সচিত্র নমুনা প্রকাশ পেল ক'দিন আগে। আবারও আবু গারিবের নির্লজ্জ কায়দায় অত্যাচার। পাশাপাশি ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড 'নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বাজারে ছেড়েছে বসরার এক ইরাকি কিশোরকে ব্রিটিশ সেনাদের বর্বরোচিত প্রহারের ভিডিওচিত্র। আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবার বিষয়টি নিয়ে তেমন সোরগোল করেনি। এই দফা ইউরোপীয় মিডিয়া ব্যস্ত থেকেছে মহানবী (সাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে।

স্বীকারোক্তি আদায়ে বন্দি নির্যাতন কোনো নতুন ঘটনা নয়। ইতিহাসের প্রতিটি পাতাজুড়ে আছে বীভৎস নির্যাতনের কাহিনী। খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে রচিত হোমারের 'ইলিয়াডে'ও আছে বন্দি নির্যাতনের বর্ণনা। ৫০০ বছর আগে স্পেনে ইনকুইজিশন, ফরাসি বিপ্লব কিংবা দুটি বিশ্বযুদ্ধ-প্রায় প্রতিটি সংঘাত-সংঘর্ষের সঙ্গে অবধারিতভাবে বন্দি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সেভাবে দেখলে ইরাক বা আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা যা করছে তা নতুন কিছু নয়; ইতিহাসের ধারাবাহিকতা মাত্র। কিন্তু সভ্য দুনিয়ার এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা শুধু ইতিহাসের দোহাই দিয়ে মেনে নেয়া কষ্টকর।

যুদ্ধক্ষেত্রে আটক বন্দিদের প্রতি আচরণ

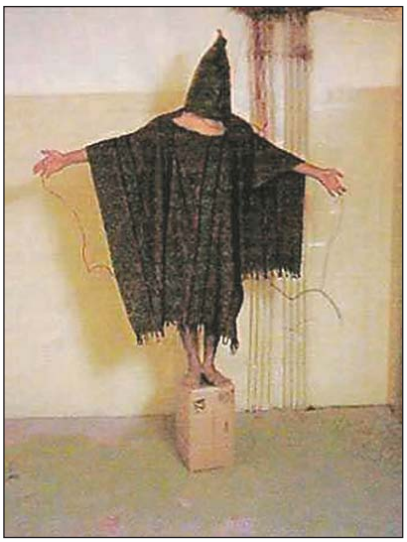

আবুগারিব কারাগারের বন্দিকে মানসিক নির্যাতন

কেমন হবে সেই সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন আছে। ১৯৪৯ সালে তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ১৭ অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 'যুদ্ধবন্দিদের ওপর কোনো রকম শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন বা অন্য কোনো প্রকার জোরাজুরি করা যাবে না।' এ ছাড়া ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'কাউকেই কোনো প্রকার নির্যাতন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক কিংবা মানহানিকর আচরণের বিষয় বানানো যাবে না।' আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে 'এমন কোনো ইচ্ছাকৃত কাজ যা কোনো ব্যক্তির শারীরিক কিংবা মানসিক পীড়নের কারণ', সেটাই নির্যাতন। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইরাক, আফগানিস্তান কিংবা গুয়ান্তানামো বেতে মার্কিন কিংবা ব্রিটিশ সেনারা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান দেখায়নি।

আবু গারিব কিংবা গুয়ান্তানামোতে বন্দিদের প্রতি অমানবিক নির্যাতনের যে চিত্র বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে, তা নেহাত দৈবক্রমে প্রকাশ পেয়েছে। বন্দি নির্যাতনের ব্যাপারটি খুবই সংবেদনশীল এবং গোপনে আটক বন্দিদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য ঠিক কোন ধরনের 'কৌশল' প্রয়োগ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে মিডিয়ার কাছে কেউই মুখ খোলে না। উপরন্তু গুয়ান্তানামো বেতে আটক আফগান বন্দিদের যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবন্দির মর্যাদা দেয়নি। ওয়াশিংটনের ভাষায় তারা 'অবৈধ যোদ্ধা'। তাই এসব বন্দি আন্তর্জাতিক আইনের আওতাধীন অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে ইরাকি বন্দিদের অন্তত জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্র ইরাক যুদ্ধকে জেনেভা কনভেনশন নীতিমালার অধীন বলে ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেসব কেবলই ফাঁকা বুলি ছিল।

আটক বন্দিদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যে নির্দয় হবে সেটা বোঝা গিয়েছিল আফগানিস্তান যুদ্ধের সময়েই। ২০০২ সালের জানুয়ারিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে আটক আল-কায়েদা বা তালেবান যোদ্ধা যুদ্ধবন্দি নয় বিধায় তারা জেনেভা কনভেনশনের অধিকার পাবে না। এর আগে ৯/১১-র ঠিক পরপরই ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি (যিনি সর্বমহলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক হিসেবে পরিচিত) বলেন, 'আপনারা চাইলে আমাদের অন্ধকার দিকটিতেও কাজ করতে হবে।' 'অন্ধকার দিক' বলতে চেনি বুঝিয়েছিলেন জিজ্ঞাসাবাদের ধরনের ব্যাপারটি। সন্দেহভাজন 'সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে 'মূল্যবান' তথ্য আদায়ের জন্য শারীরিক নির্যাতনের বিষয়টি বুশ প্রশাসন একরকম অনুমোদন দেয়। আগে জিজ্ঞাসাবাদের কাজগুলো করতো মূলত এফবিআই, ৯/১১-র পর এই দায়িত্ব বর্তায় সিআইএর ওপর। সিআইএর তদানীন্তন সন্ত্রাসবিরোধী সেলের প্রধান কফার ব্ল্যাক বলেন, '৯/১১-র পর হাতের দস্তানা খুলে গেছে।' বুশ প্রশাসনও জানিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসাবাদকালে কেবল মৃত্যু কিংবা অঙ্গহানি না ঘটলে নির্যাতনের জন্য সিআইএকে কোনো রকম আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে না।

স্বীকারোক্তি আদায়ে ঠিক কী ধরনের কৌশল নেয়া হবে সে ব্যাপারে ওয়াশিংটনে কর্তাব্যক্তিরা বেশ ক'বার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। এরপর

যেসব কৌশল অনুমোদিত হয় সেগুলোর নাম দেয়া হয় 'উন্নত জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল'। কৌশলগুলো কী সে ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসন কখনোই মুখ খোলেনি। তবে জানা যায়, সিআইএ ৫-৬টি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। অনুমোদিত একটি নির্যাতন কৌশলের নাম 'ওয়াটার বোর্ডিং'। কায়দাটা এমন : একটি ভেজা কাপড় বন্দির মুখের ওপর রেখে ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ফেলা হয়। বন্দির মনে হতে থাকে তাকে পানিতে ডোবানো হচ্ছে। আরেকটি 'উন্নত' কায়দার নাম 'টর্চার লাইট'। এই কায়দায় বন্দির মাথায় চোখ-নাক ঢাকা একটি গন্ধযুক্ত মস্তকাবরণ পরিয়ে দেয়া হয়। এরপর নগ্ন অবস্থায় তাকে অন্ধকার এবং শীতল কোনো কক্ষে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। আধুনিককালে এই নির্যাতন কৌশল ব্রিটিশ গোয়েন্দারা প্রয়োগ করে আইআরএ গেরিলাদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য। এছাড়া প্যালেস্টাইনি বন্দিদের ওপরও নির্যাতন চালায় ইসরায়েলিরা।

গুয়ান্তানামো কিংবা আবু গারিবের অভ্যন্তরে অবশ্য এসব নির্যাতন কৌশল ছাড়াও আরো ভয়াবহ ও অভিনব কায়দায় অত্যাচার করা হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের কাছ থেকে জানা গেছে, বেধড়ক প্রহার কিংবা বৈদ্যুতিক শক ছাড়াও তাদের নানাভাবে পীড়ন করা হয়েছে। বন্দিদের ওপর হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেয়া, দিনের পর দিন পানি পান না করতে দেয়া, পবিত্র কোরআন অবমাননা, সমকামিতায় বাধ্য করা, নারী বন্দিদের গণধর্ষণ ছাড়াও আরো বিচিত্র ও বিকৃত উপায়ে বন্দিদের নির্যাতন করা হয়েছে এবং সম্ভবত এখনো হচ্ছে। এমনকি নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে ২০০৩ সালে রামসফেল্ড জিওফ্রে মিলার নামে এক নিষ্ঠুর জেনারেলকে গুয়ান্তনামো বে থেকে আবু গারিবে বদলি করে পাঠান। এর পরই আবু গারিবে ঘটে সেই সব ন্যক্কারজনক ঘটনা, যার ছবি আমরা পত্রিকায় দেখেছি। জেনারেল মিলার অধস্তনদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বন্দিদের যেন সার্বক্ষণিক নির্যাতনের মধ্যে রাখা হয়। আবু গারিবের অনেক সেনা কর্মকর্তা নাম না প্রকাশ করার শর্তে মিডিয়াকে জানিয়েছেন, তারা বন্দিদের সেল থেকে প্রতিনিয়ত আর্তনাদ শুনতে পেতেন। কিন্তু তাদের কিছুই করার ছিল না। কারণ নির্যাতনের কাজটি করতো সিআইএর লোকজন। তাছাড়া, 'অভিজ্ঞ' ইসরায়েলি জিজ্ঞাসাবাদ কারীরাও নির্যাতনের কাজে জড়িত থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আটক 'মূল্যবান বন্দি'দের কঠোর নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারাই মূলত 'মূল্যবান'। এমনই এক বন্দি আল-কায়েদার শীর্ষ নেতা মোহাম্মদ আল কাতানি। সিআইএর হেফাজতে তাকে বিচিত্র কায়দায় নির্যাতন করা হয়েছিল। শরীর বস্ত্রহীন করে তার গলায় রশি বেঁধে কুকুরের মতো

হাতে ইহুদী প্রতীক আঁকা ইসরায়েলি গোয়েন্দা

অনুমোদিত নির্যাতন কৌশল

২০০২ সালের ডিসেম্বরে রামসফেল্ড 'অসহযোগী' বন্দিদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য ১৬টি জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল অনুমোদন করেন। পরে ২০০৩ সালের এপ্রিলে এর অনেকগুলো বাতিল করেন বলা হলেও, এখনো সিআইএ সেসব কৌশল প্রয়োগ করছে বলে অনুমান করা যায়। কৌশলগুলো হচ্ছে :

* দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রাখা * শরীরের পোশাক খুলে নেয়া * ইন্দ্রিয়গুলোকে কাজ করতে না দেয়া * জিজ্ঞাসাবাদকালে মাথা-চোখ ঢেকে রাখা * দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ * বন্দির বিশেষ কোনো ভীতিকে কাজে লাগানো * দাঁড়ি মুড়ে দেয়া * দ্রুত প্রশ্ন করা * ধাক্কা বা খোঁচা দেয়া * ঘুমাতে না দেয়া * দুর্গন্ধময় কক্ষে রাখা * প্রলোভন দেখানো * ঠাণ্ডা আবহাওয়া কিংবা পানিতে দাঁড় করিয়ে রাখা * মুখে কিংবা পেটে চড়-থাপ্পড় * ওয়াটার বোর্ডিং : চোখ বেঁধে মুখে পানি ঢেলে দেয়া * বন্দি বা তার কোনো নিকটাত্মীয়কে হত্যার হুমকি

আচরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। চার পায়ে ভর করে থাকা অবস্থায় তার পিঠে চেপে বসেছিল এক মহিলা জিজ্ঞেসাবাদকারী। কাতানিকে বলা হয়েছিল, তার মা আর বোন বেশ্যা। জিজ্ঞাসাবাদকালে বাধ্য করা হয়েছিল মাথায় নারীদের অন্তর্বাস পরতে এবং পুরুষ জিজ্ঞাসাবাদকারীর সঙ্গে নাচতে। অবশেষে তার ওপর লেলিয়ে দেয়া হয় কুকুর। নির্যাতনের এই বর্ণনা পাওয়া যায় মার্কিন সেনাবাহিনীর সাউদার্ন কমান্ডের এক রিপোর্টে।

মার্কিন বাহিনীর দাবি, এ জাতীয় নির্যাতন কৌশলে ভালো কাজ দেয়। যেমন কাতানির কাছ থেকে আল-কায়েদার কর্মকান্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। আসলেই কি তাই? সিআইএর এক সাবেক কর্মকর্তা নাম গোপন রেখে নিউ জউইক ম্যাগাজিনকে বলেছেন, যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার সবটাই সত্য নয়। তাছাড়া সাধারণ কৌশলে যে সব তথ্য পাওয়া যেতো না, এমনটা বলা যাবে না। এ ধরনের নির্যাতনের মাধ্যমে যে সত্যিকার তথ্য আদায় হয় না তার উদাহরণও আছে। যেমন ইরাক যুদ্ধের আগে আফগানিস্তান থেকে আটক আল-কায়েদা নেতা আল-লিবিকে নির্যাতন করে জানতে পারে, ২০০০ সালের ডিসেম্বরে আল-কায়েদার সন্ত্রাসীরা ইরাকে গিয়েছিল রাসায়নিক এবং জীবাণু অস্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে। পরবর্তীতে বুশ প্রশাসন এই তথ্য ইরাক যুদ্ধের সপক্ষে কাজে লাগায়। জাতিসংঘে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল লিবির বরাত দিয়ে তথ্যসমূহ উপস্থাপন করেন। ইরাক যুদ্ধের সাফাই গেয়েছিলেন ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। পরবর্তীতে প্রকাশ পায়, পাওয়েলের ভাষণের পর আল-লিবি তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে। আসলে নির্যাতন করে লিবির মুখ দিয়ে মার্কিন প্রশাসন নিজেদের পক্ষে কথা আদায় করে নিয়েছিল।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মার্কিন প্রশাসন আরেকটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, যাকে বলে 'রেনডিশন' বা 'বন্দি স্থানান্তর'। এই প্রক্রিয়া অনুসারে বন্দিদের ভিন্ন কোনো দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। সচরাচর পূর্ব ইউরোপ কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র দেশসমূহ, যেখানে জিজ্ঞাসবাদ আইন তেমন কড়া নয়। যেমন পোল্যান্ড কিংবা মিসরে নিয়ে যাওয়া হয়। আল-লিবিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল মিসরে নিয়ে। এসব দেশে অত্যাচার-নির্যাতনের জন্য মার্কিন প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হয় না। ব্যাপারটি মূলত আইন ফাঁকি দেয়ার ফন্দি বৈ অন্য কিছু নয়।

নির্মম জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতির ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যেমন ক্ষোভ আছে, তেমনি হোয়াইট হলেও আছে বিরুদ্ধমত। অ্যারিজোনার বর্ষীয়ান সিনেটর জন ম্যাককেইন বন্দি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন পাসের জন্য এক বিল উপস্থাপন করেন। ম্যাককেইন ভিয়েতনাম যুদ্ধে ধরা পড়েছিলেন এবং যুদ্ধবন্দি হিসেবে নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। ম্যাককেইন সব ধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অমর্যাদাকর জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে যে বিল আনেন তা সিনেটে ৯০-৯ ভোটে পাস হয়েছে। কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট চেনি এবং সিআইএ পরিচালক পোর্টার গস এই আইনের বিরোধী। তাদের ভাষায়, এ আইন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হাত-পা বেঁধে ফেলবে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে বন্দি নির্যাতনের ব্যাপারটি আসলে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই থাকবে, এটা অনুমান করা যায়। মাঝে অমানুষিক নির্যাতনের চড়া মূল্য দেবে ইরাকি কিংবা আফগান বন্দিরা। এ পর্যন্ত ক'জন বন্দি যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ব্রিটেনের হাতে আছে, সেটা বুশ বা ব্লেয়ার প্রশাসন জানায়নি। এদের কোন অপরাধে আটকে রাখা হয়েছে সেটাও অজানা। এমনকি কোথায়, কোন কারাগারে সেটাও কেউ জানে না। এসব বন্দি কোনো আইনজীবীর সহায়তাও পায় না। আন্তর্জাতিক আইনের ধারক-বাহকেরা যদি এভাবেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, তাহলে প্রতিআক্রমণটাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়?